بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ মোতাবেক ১১ তাবুক, ১৪০৫ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আল্লাহ্ তা'লার ওপর মহানবী (সা.)-এর 'তাওয়াক্কুল' (খোদানির্ভরতা) সংক্রান্ত আলোচনার ধারাবাহিকতায় যা গত জুমুআয় বর্ণনা করেছিলাম, আজও এই একই বিষয় নিয়ে আলোচনা অব্যাহত থাকবে।

মু'মিনদেরকে তাওয়াক্কুলের উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি (সা.) যা বলেছেন, তা হযরত আবু দারদা (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিনি (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় সাত বার এই দোয়া পাঠ করবে–

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

অর্থাৎ 'আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; তাঁরই ওপর আমি ভরসা করেছি এবং তিনি মহান আরশের প্রভু'– আল্লাহ্ তার সেসব উদ্বেগের বিষয় থেকে তাকে মুক্ত রাখার জন্য যথেষ্ট হবেন যা তাকে চিন্তিত করে; সে এতে সত্যবাদী হোক বা মিথ্যাবাদী।

মহানবী (সা.) নিজের জন্য তাওয়াক্কুলের (তথা খোদানির্ভরতার) বিষয়ে কীভাবে দোয়া করতেন, সে সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েতে আছে; হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন রুকূতে যেতেন তখন এই দোয়া পাঠ করতেন:

اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ أَنْتَ رَبِّي خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَدَمِي وَلَحْمِي وَعَظْمِي وَعَصَبِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ্! আমি তোমার জন্যই রুকূ করেছি, তোমার প্রতিই ঈমান এনেছি, নিজের সত্তাকে তোমার কাছেই সঁপে দিয়েছি এবং তোমার ওপরই তাওয়াক্কুল করেছি। তুমিই আমার প্রভু। আমার শ্রবণেন্দ্রিয়, দৃষ্টি, রক্ত, মাংস, অস্থি ও স্নায়ু– সবকিছুই সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ্র সমীপে অবনত।

আবার অপর একটি রেওয়ায়েতে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, যখনই আমার কোনো দুশ্চিন্তা হতো, জিবরাঈল (আ.) আমার সামনে আত্মপ্রকাশ করে বলতেন, হে মুহাম্মদ! আপনি বলুন:

تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا

অর্থাৎ, 'আমি সেই চিরঞ্জীব সত্তার ওপর তাওয়াক্কুল করলাম, যাঁর কোনো মৃত্যু নেই। সব প্রশংসা আল্লাহ্রই– যিনি কখনো কোনো পুত্রসন্তান গ্রহণ করেন নি এবং তাঁর রাজত্বে কোনো অংশীদার নেই। আর তাঁর এমন কোনো বন্ধু নেই যে, দুর্বলতার কারণে তার কাছে তিনি সাহায্য চাইবেন। আর তুমি যথাযথভাবে তাঁর মহিমা-গৌরব ঘোষণা করো।'

তাউস (রহ.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে বলতে শুনেছেন যে, মহানবী (সা.) যখন রাতে তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য উঠতেন তখন বলতেন; এটি

একটি সুদীর্ঘ দোয়া, এর অনুবাদ হলো– 'হে আল্লাহ্! সর্বপ্রকার প্রশংসা তোমারই জন্য, তুমি স্বর্গ-মর্ত্যের এবং এগুলোর মাঝে যা কিছু আছে সেগুলোকে স্থায়িত্ব ও স্থিতিদাতা। সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য, স্বর্গ-মর্ত্যের এবং এদের মধ্যে বিরাজমান সবকিছুর রাজত্ব তোমারই। সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য, তুমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর এবং এগুলোর অন্তর্বর্তী সবকিছুর নূর। সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য, তুমি স্বর্গ-মর্ত্যের এবং এগুলোতে বিরাজমান সবকিছুর বাদশাহ। সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য, তুমিই সত্য, তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য, তোমার সাথে সাক্ষাৎ সুনিশ্চিত, তোমার বাণী সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, সকল নবী সত্য, মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-ও সত্য এবং কিয়ামতের ক্ষণটিও সত্য। হে আল্লাহ্! আমি তোমারই সমীপে আত্মসমর্পণ করেছি, তোমার প্রতিই ঈমান এনেছি, তোমার ওপরই নির্ভর করেছি, তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করেছি এবং তোমারই খাতিরে এই বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়েছি বা তোমারই শক্তিতে বিরোধীদের মোকাবিলা করেছি আর তোমার দরবারেই সিদ্ধান্ত চেয়েছি। অতএব তুমি আমার পূর্বাপর সমস্ত ভুলক্রটি ক্ষমা করে দাও এবং তা-ও ক্ষমা করো যা আমি গোপনে করেছি আর যা প্রকাশ করেছি। তুমিই অগ্রগামী করো এবং তুমিই পশ্চাৎগামী করো। তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই।' অথবা তিনি (সা.) বলতেন: لَا إِلٰهَ غَيْرُكَ অর্থাৎ 'তুমি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই।' এটি বুখারীর রেওয়ায়েত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলতেন, 'হে আল্লাহ্! আমি তোমারই আনুগত্য স্বীকার করি, তোমার ওপর ঈমান আনি, তোমার ওপর তাওয়াক্কুল করি এবং তোমার কাছেই বিনত হই। তোমার সাহায্যেই আমি মোকাবিলা করি। হে আল্লাহ্! আমি এই বিষয় থেকে তোমার মর্যাদার আশ্রয় চাইছি যে, তুমি আমাকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করবে। তুমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তুমিই সেই চিরঞ্জীব সত্তা যাঁর কখনো মৃত্যু ঘটবে না; অথচ জিন ও ইনসান সবাই মৃত্যুবরণ করবে।'

মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টি সর্বদাই আল্লাহ্ তা'লার প্রতি নিবদ্ধ থাকত। তাঁর এই গুণের সর্বোচ্চ মান উল্লেখ করে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক স্থানে লিখেছেন, বরং বক্তৃতায় বর্ণনা করেছেন যে, রসূল করীম (সা.)-এর আল্লাহ্ তা'লার ওপর এমন ভরসা ছিল যে, যে-কোনো বিপদ ও কঠিন মুহূর্তে তিনি কেবল তাঁর প্রতিই দৃষ্টি রাখতেন এবং তিনি ছাড়া অন্য সব কিছু থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিতেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই, তিনি বর্তমানকালের সুফিদের মতো উপায়-উপকরণ বর্জনকারী ছিলেন না; *অর্থাৎ বর্তমানের সুফিরা যেমনটি বলে থাকে, উপকরণের প্রয়োজন নেই, কেবল তাওয়াক্কুলই যথেষ্ট;* তিনি উপকরণ ব্যবহার করতেন। কারণ উপকরণ বর্জন করা প্রকারান্তরে আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির অবমাননা করা এবং তাঁর সৃষ্টিকে নিরর্থক প্রতিপন্ন করার শামিল। কিন্তু সব উপায়-উপকরণ ব্যবহার করার পর তিনি পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্ তা'লার ওপরই ভরসা করতেন। যদিও তিনি উপকরণ ব্যবহার করতেন, কিন্তু সেগুলোর ওপর কখনো নির্ভর বা তাওয়াক্কুল করতেন না, বরং কেবল আল্লাহ্‌রই অনুগ্রহের প্রত্যাশী থাকতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) যে-কোনো উদ্‌বেগ-উৎকণ্ঠার সময় বলতেন:

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ

অর্থাৎ 'আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি মহান আরশের প্রভু; আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি আকাশসমূহের প্রভু, পৃথিবীর প্রভু এবং সম্মানিত আরশের প্রভু'; অর্থাৎ আমার ভরসা ও তাওয়াক্কুল কেবল আল্লাহ্ তা'লার ওপরই।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ অর্থাৎ 'আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত-না উত্তম কর্মবিধায়ক!'– এই কথাটি হযরত ইব্রাহীম (আ.) তখন বলেছিলেন যখন তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হচ্ছিল; আর হযরত মুহাম্মদ (সা.) এটি তখন বলেছিলেন যখন কাফিররা বলেছিল: 'লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে বিশাল প্রস্তুতি নিয়েছে, সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো।' হাদীসের ভাষ্যকারদের মতে, এটি উহুদ, হামরাউল আসাদ অথবা পরিখার যুদ্ধের সময় বলা হয়েছিল। ফলে এই বিষয়টি তাদের ঈমান আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তারা বলেছিলেন: حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ অর্থাৎ আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত-না উত্তম কর্মবিধায়ক! বুখারীতে এই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

বিভিন্ন উপলক্ষ্যে মক্কার মুশরিকদের মহানবী (সা.)-এর কাছে নানা প্রস্তাব উপস্থাপন, হরেক রকমের প্রলোভন দেখানো, আর নবী করীম (সা.)-এর আল্লাহ্ তা'লার ওপর অভূতপূর্ব আস্থা রেখে তাদের জবাব দেওয়া– এ ঘটনাগুলো কেমন ছিল? এমনই একটি সুযোগের কথা ইবনে ইসহাক উল্লেখ করে বলেছেন, একদিন কুরাইশ সর্দার উতবা বিন রবীআ কুরাইশের এক বৈঠকে বসে ছিল, আর রসূলুল্লাহ্ (সা.) একা মসজিদে হারামে উপস্থিত ছিলেন। উতবা বলে, 'হে কুরাইশ! আমি কি মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে গিয়ে তাঁর সাথে কথা বলব না? আমি তাঁর সামনে কয়েকটি প্রস্তাব উপস্থাপন করব, হয়ত তিনি সেগুলোর মধ্য থেকে কোনো একটি গ্রহণ করে নেবেন। আমরা তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে দেবো আর তিনি আমাদের বিরুদ্ধে নিজের এই প্রচারণা থেকে ক্ষান্ত হবেন।' এটি হযরত হামযার (রা.) ইসলাম গ্রহণের পরের ঘটনা। কুরাইশ দেখতে পাচ্ছিল, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সঙ্গীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তখন কুরাইশ বলে, 'অবশ্যই হে আবুল ওয়ালীদ! আপনিই তাঁর সাথে কথা বলুন।'

সুতরাং উতবা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে আসে; সে তাঁর কাছে বসে বলে, 'হে ভাতিজা! তুমি ভালো করেই জানো, নিজের বংশে তোমার অবস্থান ও মর্যাদা অনেক উঁচু; তুমি বংশমর্যাদার দিক থেকেও সম্মানিত। কিন্তু তুমি তোমার জাতির সামনে এমন এক বিরাট বিষয় নিয়ে এসেছ যা তাদের ঐক্যকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে; তাদের বুদ্ধিমত্তাকে তুমি তুচ্ছ আখ্যায়িত করেছ, তাদের উপাস্য ও ধর্মকে মন্দ বলেছ এবং তাদের অতীত পিতৃপুরুষদের কাফির সাব্যস্ত করেছ। এখন আমার কয়েকটি কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো। আমি তোমার সামনে কয়েকটি প্রস্তাব রাখছি, হয়ত তুমি সেগুলোর কোনো একটি গ্রহণ করবে।' রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, 'বলুন আবুল ওয়ালীদ, আমি শুনছি।' উতবা বলে, 'ভাতিজা! এই প্রচারের মাধ্যমে যদি তোমার উদ্দেশ্য ধনসম্পদ অর্জন করা হয়, তবে আমরা আমাদের সম্পদ একত্রিত করে তোমাকে এত বেশি সম্পদ দেবো যে, তুমি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্পদশালী হয়ে যাবে। যদি তুমি সম্মান ও নেতৃত্ব চাও তবে আমরা তোমাকে আমাদের সর্দার বানিয়ে নেব; এরপর তোমার পরামর্শ ছাড়া আমরা কোনো সিদ্ধান্ত নেব না। যদি তুমি বাদশাহ হতে চাও তবে আমরা তোমাকে আমাদের বাদশাহ হিসেবে মেনে নেব। আর যদি তোমার ওপর কোনো প্রেতাত্মা বা জিন চেপে বসে থাকে যা তুমি নিজের থেকে দূর করতে পারছ না; *সেকালের মানুষের মাঝে এই কুসংস্কার প্রচলিত ছিল যে হয়ত জিন ভর করেছে*; তবে আমরা সেরা চিকিৎসকদের এনে তোমার চিকিৎসা করাবো এবং এতে আমাদের ধনসম্পদ অকাতরে ব্যয় করব, যতক্ষণ না তুমি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠো; কারণ কখনো কখনো মানুষের ওপর এমন অবস্থা চেপে বসে যার চিকিৎসা করাতে হয়।'

রসূলুল্লাহ্ (সা.) তার কথা শুনতে থাকেন। এরপর তিনি (সা.) বলেন, 'হে আবুল ওয়ালীদ! তোমার কথা কি শেষ হয়েছে?' সে বলে, 'হ্যাঁ।' মহানবী (সা.) বলেন, 'এখন আমার কথা শোনো।' সে বলে, 'অবশ্যই! আমি শুনছি।' তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) সূরা হা-মীম আস-সাজদার এই আয়াতগুলো তিলাওয়াত করেন:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ○ حٰمٓ ○ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ○ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ○ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ○ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ (সূরা হা-মীম আস-সাজদা:১-৬)

অর্থ: 'আমি আল্লাহ্‌র নামে পাঠ করছি, যিনি পরম করুণাময়, বারবার কৃপাকারী। হামীদ (প্রশংসিত) ও মজীদ (মহিমান্বিত) খোদার গুণাবলি এই সূরায় বর্ণনা করা হয়েছে। এই কুরআন পরম করুণাময় ও বারবার কৃপাকারী খোদার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। এটি এমন এক গ্রন্থ যার আয়াতসমূহ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, বহুল পঠিত, অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল (অর্থাৎ আরবী) ভাষায় বর্ণিত– সে জাতির জন্য যারা (আধ্যাত্মিক) জ্ঞান রাখে। (এ কিতাব পুণ্যবানদের জন্য) সুসংবাদদাতা এবং (দুষ্কৃতকারীদের জন্য) সতর্ককারী, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং তারা শোনে না। আর তারা বলল, 'যে বিষয়ের দিকে তুমি আমাদের আহ্বান করছ সে বিষয়ে আমাদের অন্তর পর্দাবৃত।' *অর্থাৎ তা আমাদের অন্তরে কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না।*

রসূলুল্লাহ্ (সা.) এই আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করতে থাকেন আর উতবা নিথর হয়ে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে তা শুনতে থাকে। সে তার দুই হাত পেছনে ভর দিয়ে একাগ্রচিত্তে কুরআন শুনছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন সিজদার আয়াতে পৌঁছান তখন তিনি (সা.) সিজদা করেন। এরপর উতবাকে বলেন, 'হে আবুল ওয়ালীদ! যা শোনার ছিল তা তুমি শুনে নিয়েছ। এখন সিদ্ধান্ত তোমার হাতে। তোমার কথাও আমি শুনেছি, আমার কথাও তুমি শুনেছ; এখন তুমিই সিদ্ধান্ত নাও, আমার সিদ্ধান্ত নেবার কিছু নেই।'

মহানবী (সা.)-এর আল্লাহ্ তা'লার ওপর যে পূর্ণ আস্থা ও তাওয়াক্কুল ছিল, তা প্রতিদিন এক নিত্যনূতন মহিমায় প্রকাশিত হতো। ইতিহাস সাক্ষী, উতবাকে এই উত্তর দেবার পরও রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজের সেই আদর্শেই অবিচল থাকেন। তিনি একথা বলেন নি যে, তিনি বদলে যাবেন; বরং তিনি তাকে বলেছেন, তুমি নিজেকে পরিবর্তন করো এবং নিজেই সিদ্ধান্ত নাও। আর তিনি (সা.) আল্লাহ্‌র ধর্মের প্রচার ও তবলীগ অব্যাহত রাখেন।

এরপর কাফিরদের এই পুরো দলটি একসাথে আবু তালিবের কাছে গিয়ে বলে, 'আমরা আপনার কাছে আবেদন জানিয়েছিলাম, আপনি আপনার ভাতিজাকে নিরস্ত করুন; কিন্তু আপনি তাকে থামান নি। হয় আমরা তাকে আমাদের বিষয়ে এমন কথাবার্তা বলা থেকে বিরত রাখব, নতুবা তার ও আপনার সাথে লড়াই করব– যতক্ষণ না উভয় পক্ষের একটি ধ্বংস হয়ে যায়।'

কুরাইশ যখন আবু তালিবকে এ কথা বলে, তখন তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে ডেকে পাঠান এবং বলেন, 'হে আমার ভাতিজা! আমার ওপর এমন বোঝা চাপিও না যা বহন করা আমার পক্ষে অসম্ভব।' রসূলুল্লাহ্ (সা.) ভাবলেন, তাঁর চাচা হয়ত তাঁকে সাহায্য করা ছেড়ে দেবেন এবং তাঁকে কুরাইশের হাতে তুলে দেবেন। তিনি (সা.) বলেন, 'চাচাজান! খোদার কসম, এরা যদি আমার ডান পাশে সূর্য আর বাম পাশে চাঁদ এনে রেখে দেয়, তবুও আমি আমার দায়িত্ব পালন করা থেকে বিরত হবো না; আমি আমার কাজ চালিয়ে যাব– যতক্ষণ না খোদা একে পূর্ণতা দান করছেন, কিংবা আমি এই প্রচেষ্টায় মৃত্যুবরণ না করছি।' এরপর

তিনি (সা.) উঠে সেখান থেকে প্রস্থান করতে গেলে আবু তালিব তাঁকে ডেকে বলেন, 'হে আমার ভাতিজা! তোমার যা ইচ্ছা তুমি বলো। খোদার কসম! কোনো মূল্যে আমি তোমাকে কখনো তাদের হাতে সঁপে দেবো না।'

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) ঐতিহাসিক ও বাস্তব ঘটনাগুলোর চিত্র তুলে ধরে এভাবে বর্ণনা করেছেন: মহানবী (সা.) যখন আল্লাহ্ তা'লার তওহীদের বিষয়ে মানুষকে নসীহত করতে শুরু করলেন এবং শিরকের খণ্ডন শুরু করলেন, তখন মক্কাবাসীদের কাছে এ বিষয়টি অত্যন্ত অপ্রীতিকর ঠেকল। অবশেষে একদিন তারা সর্বসম্মতভাবে এক প্রতিনিধিদল আকারে রসূল করীম (সা.)-এর চাচা আবু তালিবের কাছে আসে এবং তাঁকে বলে, 'আপনি আমাদের গোত্রীয় সর্দার, আমরা আপনাকে গভীরভাবে সম্মান করি এবং আপনার সম্মানের খাতিরেই এতদিন আপনার ভাতিজাকে কিছু বলি নি। কিন্তু বিষয়টি এখন সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আমরা আপনার কাছে এজন্য এসেছি যেন আপনি আমাদের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে তার সাথে শেষ কথা বলেন।' অতঃপর উতবা মহানবী (সা.)-এর কাছে যা যা বলেছিল, তারা সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করে– অর্থাৎ উচ্চ বংশের সুন্দর নারীর প্রলোভন, টাকাপয়সা ও ধনসম্পদের প্রলোভন এবং রাজত্বের প্রলোভন। তারা বলে, 'কিন্তু তাকে বলুন, সে যেন অন্ততপক্ষে আমাদের দেব-দেবীকে মন্দ বলা হতে বিরত থাকে। আমরা তাকে একথা বলছি না যে, সে আমাদের মূর্তিদের মেনে নিক; আমরা শুধু বলছি, আমাদের দেব-দেবীকে যেন মন্দ না বলে। আর সে যদি আমাদের এসব কথার কোনো একটিও না মানে, তবে আপনি তার সঙ্গ পরিত্যাগ করুন, তখন আমরা নিজেরাই তার ব্যবস্থা করব।'

আবু তালিব অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন, রসূল করীম (সা.)-কে খুব ভালোবাসতেন; তবে তার নিজের নেতৃত্বও তার কাছে খুব প্রিয় ছিল। তিনি রসূল করীম (সা.)-কে ডেকে এনে বলেন, "আজ তোমার জাতি আমার কাছে এসেছিল এবং তারা বলছিল: 'হে আবু তালিব! আমরা আপনাকে সম্মান করি এবং আপনার খাতিরেই এ পর্যন্ত আপনার ভাতিজাকে কিছুই বলি নি, কিন্তু বিষয় এখন সীমা ছাড়িয়ে গেছে। সে যদি আর কোনো কথা না-ও মানে, তবে তাকে শুধু এটুকু বলে দিন যেন সে আমাদের মূর্তিগুলোকে মন্দ না বলে। আমরা তাকে আমাদের বাদশাহ বানাতে প্রস্তুত, যদি ধনসম্পদ চায় তবে সম্পদ দিতে প্রস্তুত, আরবে তার চেয়ে বেশি বিত্তশালী কেউ থাকবে না; আমরা দিতে প্রস্তুত। যদি কোনো রূপসী স্ত্রী চায় তবে আমরা সেরা সুন্দরীর সাথে তার বিয়ে দিতে প্রস্তুত। সারকথা, সে যে-কোনো দাবি করুক না কেন, আমরা তা মেটাতে প্রস্তুত; সে শুধু আমাদের মূর্তিপ্রতিমাগুলোকে মন্দ বলা ছেড়ে দিক'।"

রসূল করীম (সা.)-এর ওপর আবু তালিবের অনেক অনুগ্রহ ছিল; তিনি শৈশব থেকে অত্যন্ত স্নেহ-মমতায় তাঁকে লালন-পালন করেছিলেন এবং প্রতিটি দুঃখকষ্টে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। রসূল করীম (সা.) যখন তাঁর চাচার এই অবস্থা দেখেন, তখন তার মহানুভবতার কথা স্মরণ করে তাঁর চোখে অশ্রু নেমে আসে। কিন্তু তিনি (সা.) বলেন, 'চাচাজান! আমি তো আপনাকে বলছি না, আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আপনি নির্দ্বিধায় নিজ গোত্রের সাথে থাকুন এবং আমাকে ছেড়ে দিন। খোদার কসম! এরা যদি সূর্যকে আমার ডান পাশে আর চাঁদকে আমার বাম পাশে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়, তবুও আমি এক খোদার যিকর থেকে বিরত হবো না।'

দেখুন, খোদা তা'লার সত্তায় কতখানি আস্থা ও দৃঢ়বিশ্বাস ছিল! অথচ সূর্য তার নিজ স্থান থেকে সরে যাওয়া এত বড়ো অলৌকিক ঘটনা যে, তা ঘটলে মানুষ স্তম্ভিত হয়ে যাবে;

কিন্তু তিনি (সা.) বলেন, এরা যদি সূর্যকে নিজ স্থান থেকে সরিয়ে আমার সামনে এনে দাঁড় করায়, এরা যদি চাঁদকে নিজ স্থান থেকে সরিয়ে আমার সামনে এনে দাঁড় করায়, তবুও খোদা তা'লার সত্তার ওপর আমার এমন বিশ্বাস ও আস্থা রয়েছে যে, আমি এসব অলৌকিক ঘটনাকে কেবল ভেলকিবাজি মনে করব এবং তাদের মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে সবসময় আপত্তি করব আর নিজের কাজ থেকে কখনো বিরত হবো না। এটি আল্লাহ্ তা'লার সত্তার ওপর ঈমান ও পূর্ণ তাওয়াক্কুলের এমন এক পর্যায় যা আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না।

এই ঘটনার উল্লেখ করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেন, যখন এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হলো যে, মুশরিকরা অপবিত্র, নোংরা, নিকৃষ্টতম জীব, নির্বোধ এবং শয়তানের বংশধর, তাদের উপাস্যগুলো হলো আগুনের ইন্ধন এবং জাহান্নামের ইন্ধন– তখন আবু তালিব মহানবী (সা.)-কে ডেকে বলেনঃ 'হে আমার ভাতিজা! এখন তোমার গালিগালাজের কারণে জাতি দারুণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে এবং অচিরেই হয়ত তারা তোমাকেও হত্যা করবে এবং সাথে আমাকেও। তুমি তাদের বিজ্ঞজনদের নির্বোধ বলেছ, তাদের বুযুর্গদেরকে সৃষ্টির নিকৃষ্টতম জীব আখ্যায়িত করেছ, আর তাদের সম্মানিত উপাস্যদের নাম রেখেছ 'জাহান্নামের খড়ি' ও 'আগুনের ইন্ধন', আর মোটের ওপর তাদের সবাইকে অপবিত্র ও শয়তানের বংশধর সাব্যস্ত করেছ। আমি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে বলছি, তুমি তোমার ভাষা সংযত করো এবং এ জাতীয় কথাবার্তা থেকে বিরত হও, অন্যথায় গোটা জাতির বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সামর্থ্য আমার নেই।' মহানবী (সা.) উত্তরে বলেন, 'হে চাচা! এটি গালিগালাজ নয়; বরং এ শুধুমাত্র বাস্তবতার বহিঃপ্রকাশ এবং প্রকৃত বিষয় যথাযথ স্থানে উপস্থাপন করা। আর এটিই তো সেই কাজ যার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। যদি এতে আমার মৃত্যুও নির্ধারিত থাকে, তবে আমি সানন্দে নিজের জন্য এই মৃত্যুকে বরণ করে নিচ্ছি। আমার জীবন তো এই পথেই উৎসর্গীকৃত। আমি মৃত্যুর ভয়ে সত্য প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতে পারি না। আর হে চাচা! আপনি হয়ত নিজের দুর্বলতা ও কষ্টের কথা ভাবছেন, সেক্ষেত্রে আমাকে আশ্রয় দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। খোদার কসম! আপনার কোনো সাহায্যের মুখাপেক্ষী আমি নই। আমি ঐশী নির্দেশাবলি পৌঁছানো থেকে কখনো বিরত হবো না। আমার কাছে আমার প্রভুর আদেশ আমার নিজ প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয়। খোদার কসম! আমি যদি এই পথে নিহতও হই, তবুও চাইব যেন বারবার জীবিত হয়ে সর্বদা এই পথেই প্রাণ বিসর্জন দিই। এটি ভয়ের বিষয় নয়; বরং তাঁর পথে কষ্ট ভোগ করার মাঝে আমি অপার আনন্দ লাভ করি।'

মহানবী (সা.) এই বক্তব্য রাখছিলেন, আর তাঁর পবিত্র চেহারায় সত্য ও আলোকোদ্ভাসিত এক আবেগ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠছিল। মহানবী (সা.) এই বক্তব্য শেষ করলে সত্যের আলো দেখে অবলীলায় আবু তালিবের অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে। তিনি বলেন, 'আমি তোমার এই মহান অবস্থা সম্পর্কে অনবগত ছিলাম! তুমি তো সম্পূর্ণ ভিন্ন এক রঙে ও ভিন্ন মহিমায় বিরাজমান! যাও, নিজের কাজে লেগে থাকো; আমি যতদিন বেঁচে আছি এবং আমার যতটুকু ক্ষমতা আছে, আমি তোমার সাথে থাকব।'

একইভাবে তায়েফ থেকে ফেরার পথে মহানবী (সা.)-এর তাওয়াক্কুল অবলম্বনের এক অপরূপ দৃষ্টান্ত রয়েছে। তিনি একা তায়েফের সর্দারদের তবলীগ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলেন, যারা অত্যাচারের চরম সীমায় পৌঁছেছিল। ফেরার পথে বাহ্যত মক্কায় প্রবেশের কোনো পরিস্থিতি ছিল না। সাথে একজন খাদেম ছিলেন, আর সেই খাদেম চিন্তিত ছিলেন যে, এখন কী হবে! কিন্তু তাঁর (সা.) নিজ প্রতিপালক-প্রভুর ওপর পূর্ণ ভরসা ছিল। এটি

উল্লেখ করতে গিয়ে সেই খাদেম হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.) বর্ণনা করেন, যখন আমি তাঁর (সা.) সকাশে নিবেদন করলাম, ‘হে আল্লাহ্‌র রসূল! এখন আপনি কীভাবে মক্কায় প্রবেশ করবেন? কেননা তারা তো আপনাকে বের করে দিয়েছে!’ রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাওয়াক্কুলের অতি মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করে উত্তর দেন, ‘হে যায়েদ! তুমি দেখবে, আল্লাহ্ তা’লা নিশ্চয়ই কোনো পথ বের করবেন; আর আল্লাহ্ তা’লা নিজের ধর্মের সাহায্যকারী, তিনি তাঁর নবীকে বিজয়ী করে ছাড়বেন।’ মহানবী (সা.) কুরাইশ সর্দারদের কাছে বার্তা পাঠান, তারা যেন তাঁকে নিরাপত্তা দিয়ে মক্কায় প্রবেশের ব্যবস্থা করে। সব সর্দারই অস্বীকার করে; অবশেষে একজন মহৎ সর্দার মুতইম বিন আদী তাঁকে নিরাপত্তা দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করানোর ঘোষণা দেয়।

মহানবী (সা.)-এর হিজরতের সময় খোদা তা’লার ওপর নির্ভরতার আদর্শ কেমন ছিল? মহানবী (সা.) যখন হিজরতের অনুমতি পেলেন, তখন তিনি হযরত আলী (রা.)-কে নিজের হিজরতের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করে তাঁর ওপর এক আত্মোৎসর্গমূলক কাজের দায়িত্ব সঁপে দেন। আর তা হলো, আজ রাতে তিনি (রা.) হুযূর (সা.)-এর পবিত্র বিছানায় সেই সবুজ বা এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী লাল রঙের ‘হাযরামী’ চাদর গায়ে দিয়ে ঘুমাবেন। *এটি ইয়েমেনের তৈরি চাদর ছিল, অঞ্চলের নামানুসারে একে হাযরামী বলা হতো।* যাহোক, মহানবী (সা.) নিজে যে চাদরটি গায়ে দিয়ে ঘুমাতেন, সেটি মুড়ি দিয়েই যেন তিনি ঘুমান। আর তিনি (সা.) নিজের সেই অনুগত-নিবেদিতপ্রাণ খাদেমকে ঐশী সাহায্য ও সমর্থনের পূর্ণ আশ্বাস দিয়ে বলেন, ‘চিন্তা কোরো না, নিশ্চিন্তে আমার বিছানায় শুয়ে থেকো; শত্রু তোমার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না।’ এছাড়া ‘সাদিক’ (পরম সত্যবাদী) ও আমীন (পরম বিশ্বস্ত) রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাঝে যেহেতু মক্কাবাসীদের রাখা আমানতসমূহের বিষয়ে চিন্তা ও দায়বদ্ধতার অনুভূতি কাজ করছিল, তাই তিনি (সা.) তাকে (অর্থাৎ হযরত আলীকে) সেসব আমানত মানুষজনকে ফেরত দিয়ে তাঁর অনুসরণে মদীনায় চলেন আসতে বলেন।

এরপর মহানবী (সা.) নিজ গৃহ থেকে বাইরে আসেন, যখন মক্কার কাফিরদের শীর্ষস্থানীয় বীরেরা– যাদের চোখ থেকে যেন রক্ত ঝরছিল– হাতে উন্মুক্ত তলোয়ার নিয়ে মহানবী (সা.)-এর ঘরের ঠিক বাইরেই অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় এই উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান ছিল যে, রাত গভীর হতেই আমরা একযোগে আক্রমণ চালিয়ে এক আঘাতেই রসূল করীম (সা.)-এর জীবনপ্রদীপ নিভিয়ে দেবো (নাউযুবিল্লাহ্)। আবু জাহেল, যে তাদের সর্দার ছিল, অত্যন্ত অহংকার ও উপহাসের সুরে বলছিল, ‘মুহাম্মদ (সা.) দাবি করে যে, তোমরা যদি তার আনুগত্য করো তবে তোমরা আরব ও অনারবের বাদশাহ হয়ে যাবে; আবার মৃত্যুর পর যখন তোমাদের পুনরায় জীবিত করা হবে, তখন তোমাদের জন্য জর্ডানের উদ্যানসমূহের ন্যায় বাগানসমূহ তৈরি করা হবে; আর যদি তোমরা এমন না করো, তবে তোমাদের মধ্যে হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হবে।’ হুযূর (সা.) যাত্রার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হন এবং বলেন, ‘হ্যাঁ, আমি এমনটিই বলে থাকি।’ আর তিনি (সা.) সূরা ইয়াসীনের এই আয়াতসমূহ পাঠ করেন:

يس ○ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ○ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ○ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ○ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ○ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ
آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ○ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ○ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ
مُقْمَحُونَ ○ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ○ (সূরা ইয়াসীন:২-১০)

এর অনুবাদ হলোঃ ‘ইয়া সাইয়্যিদু’ অর্থাৎ! হে পূর্ণতম নেতা! শপথ প্রজ্ঞাপূর্ণ কুরআনের, নিশ্চয় তুমি রসূলদের অন্তর্ভুক্ত। (আর তুমি) সরল সুদৃঢ় পথে (প্রতিষ্ঠিত) রয়েছ। এটি মহাপরাক্রমশালী, বার বার কৃপাকারী আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, যেন তুমি এরূপ এক জাতিকে সতর্ক করো যাদের পিতৃপুরুষদের সতর্ক করা হয় নি। অতএব তারা উদাসীন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। নিশ্চয় তাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রে (আমাদের) কথা পূর্ণ হয়ে গেছে, অতএব তারা ঈমান আনবে না। নিশ্চয় আমরা তাদের গলায় বেড়ি পরিয়ে দিয়েছি, যা তাদের চিবুক পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। ফলে তারা মাথা উঁচিয়ে রাখছে। আর আমরা তাদের সামনেও এক প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেছি এবং পেছনেও এক প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমরা তাদেরকে পর্দাবৃত করে দিয়েছি; ফলে তারা দেখতে পায় না।

হুযূর (সা.) এই আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করতে করতে এবং তাদের মুখে ছাই দিয়ে তাদের সম্মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েন; কিন্তু খোদার অপার কুদরত দেখুন, যাবার সময় তিনি কারো সামনে দৃশ্যমান হন নি! বরং তারা মাঝে মাঝেই ঘরের ভেতর উঁকি দিয়ে দেখে নিচ্ছিল আর নিশ্চিত হচ্ছিল, মুহাম্মদ (সা.) নিজের বিছানাতেই আছেন।

মহানবী (সা.)-এর হিজরত এবং তাঁর এই তাওয়াক্কুলের কথা ঐতিহাসিক উদ্ধৃতির বরাতে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা হলোঃ

মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা’লার পক্ষ থেকে হিজরতের নির্দেশ লাভের পর হযরত আবু বকর (রা.)-কে সঙ্গে নিয়ে সওর অভিমুখে রওয়ানা হন, যা মক্কা থেকে প্রায় ছয়-সাত মাইল দূরে অবস্থিত, আর তিনি সেই পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত একটি গুহায় সংগোপনে আশ্রয় নেন। সকালে কাফিররা যখন দেখল, তিনি (সা.) নিজ ঘরে উপস্থিত নেই এবং সব ধরনের পাহারা সত্ত্বেও তিনি (সা.) সফলভাবে বেরিয়ে গিয়েছেন, তৎক্ষণাৎ তারা তাঁর (সা.) সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। তারা মক্কার কয়েকজন দক্ষ অনুসন্ধানকারীকে সঙ্গে নেয় যারা পায়ের চিহ্ন শনাক্ত করার ব্যাপারে অত্যন্ত পারদর্শী ছিল। তারা তাদেরকে সওর পাহাড় পর্যন্ত নিয়ে যায় এবং বলে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) যদি থাকেন তাহলে এখানেই আছেন; এরপর আর কোনো চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে না। তখন এমন অবস্থা হয়েছিল, শত্রুরা গুহার একেবারে দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছিল এবং গুহার মুখও এতটা সংকীর্ণ ছিল না যে, ভেতরে উঁকি দেওয়া কষ্টকর হবে। বরং এটি প্রশস্ত মুখবিশিষ্ট উন্মুক্ত গুহা, যার ভেতরে উঁকি দিলে খুব সহজে বোঝা সম্ভব ছিল– ভেতরে কেউ অবস্থান করছে কি না। কিন্তু এহেন পরিস্থিতিতেও মহানবী (সা.)-এর মাঝে কোনো আতঙ্কের ছাপ পড়ে নি, বরং তাঁর পবিত্র সত্তার কল্যাণে হযরত আবু বকর (রা.)-এর হৃদয়ও দৃঢ় ছিল। তিনি (রা.) মূসা (আ.)-এর সঙ্গীদের মতো একথা বলেন নি, আমরা তো ধরা পড়ে গেছি। তিনি (রা.) কেবল এতটুকু বলেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! শত্রুরা আমাদের এতটা নিকটে এসে গেছে যে, তারা সামান্য নীচে তাকালেই আমাদের দেখতে পাবে। সে মুহূর্তে মহানবী (সা.) বলেন, اُسْكُتْ يَا اَبَا بَكْرٍ، اثْنَانِ، اللّٰهُ ثَالِثُهُمَا অর্থাৎ হে আবু বকর! নীরব থাকো। আমরা এখন দুইজন নই; আমাদের সাথে তৃতীয়জন আল্লাহ্ আছেন। তাই তারা কীভাবে আমাদের দেখতে পাবে? ফলাফল তা-ই হলো। শত্রুরা গুহার একেবারে দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাওয়া সত্ত্বেও তাদের সাধ্যে কুলায় নি যে, তারা আরেকটু এগিয়ে গুহার ভেতরে উঁকি দেবে। আর তারা সেখান থেকে বকবক করতে করতে এবং ‘সব শেষ! সব শেষ!’ বলতে বলতে, বৃথাচার করতে করতে ফিরে যায়। এ ঘটনার একটি দিক হলো– মূসা (আ.)-এর সঙ্গীসাথিরা ভীত হয়ে বলেছিল, হে মূসা! আমরা তো ধরা পড়ে গেছি। যেন

তারা নিজেদের সঙ্গে মূসা (আ.)-কেও মিলিয়ে ফেলেছিল এবং মনে করেছিল, এখন আমরা সবাই ফেরাউনের হাতে ধরা পড়ব। পক্ষান্তরে মহানবী (সা.)-এর খোদানির্ভরতা তাঁর সঙ্গীর ওপরও এমন প্রভাব ফেলে যে, তাঁর মুখ থেকে একথা বের হয় নি– আমরা তো ধরা পড়ে গেছি! বরং তিনি শুধু এতটুকুই বলেন, শত্রু এতটা নিকটে এসে গেছে যে, তারা যদি আমাদের দেখতে চায় তাহলে দেখতে পারে। কিন্তু মহানবী (সা.) তাঁর এ আশঙ্কা বা ধারণাটুকুও মেনে নেন নি। তিনি (সা.) বলেন, এমন ধারণা কোরো না। আমরা এখন দুইজন নই বরং আমাদের সাথে আরও একজন সত্তা রয়েছেন আর তিনি হলেন আমাদের খোদা। হিজরতের ঘটনা এবং মহানবী (সা.)-এর খোদার প্রতি আস্থা ও সাহসিকতার বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেনঃ

হযরত আবু বকর সিদ্দীকের নিষ্ঠা সেই কঠিন বিপদের সময় প্রকাশ পেয়েছিল যখন মহানবী (সা.)-কে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। যদিও কারো কারো মত ছিল তাঁকে নির্বাসিত করার, কিন্তু মূল পরিকল্পনা ছিল তাঁকে হত্যা করার। **এমন পরিস্থিতিতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার এমন এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, যা অনন্তকাল অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।** সেই কঠিন মুহূর্তে মহানবী (সা.) তাঁর সঙ্গী হিসেবে হযরত সিদ্দীককে বেছে নেওয়া তাঁর (রা.) শ্রেষ্ঠত্ব ও পরম বিশ্বস্ততার এক শক্তিশালী প্রমাণ। *তিনি (আ.) এখানে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর গুণাবলিও বর্ণনা করছেন।* এতটাই যথার্থ ছিল মহানবী (সা.)-এর নির্বাচন। সে সময় তাঁর (সা.) কাছে প্রায় সত্তর-আশিজন সাহাবী উপস্থিত ছিলেন, হযরত আলীও (রা.) তাঁর কাছে ছিলেন। কিন্তু তিনি (সা.) তাদের সবার মাঝ থেকে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে নির্বাচন করেন। এর মাঝে রহস্য কী? নিগূঢ় তাৎপর্য কী? বিষয় হলো, নবী খোদা তা'লার চোখ দিয়ে দেখে থাকেন এবং তাঁর জ্ঞানও খোদা তা'লার কাছ থেকেই লাভ হয়। এ কারণে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে কাশফ ও ইলহামের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছিলেন, এ কাজের জন্য হযরত আবু বকর সিদ্দীকই সবচেয়ে উত্তম ও যোগ্য। হযরত আবু বকর (রা.) সেই কঠিন সময়ে মহানবী (সা.)-এর সঙ্গী হয়েছিলেন। এটি ছিল এক ভয়াবহ পরীক্ষার সময়। হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবনে যখন এহেন মুহূর্ত এসেছিল তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল এবং তাদের একজন প্রকাশ্যেই তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিল। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের প্রত্যেকেই পূর্ণ বিশ্বস্ততার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। মোটকথা, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) মহানবী (সা.)-কে পুরোপুরি সঙ্গ দিয়েছিলেন এবং তাঁরা একটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, যাকে **গারে সওর** (তথা সওর গুহা) বলা হয়। কুচক্রী কাফিররা মহানবী (সা.)-কে কষ্ট দেবার নিমিত্তে নানা পরিকল্পনা করে খুঁজতে খুঁজতে সেই গুহা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) নিবেদন করেন, এখন তো তারা একেবারে আমাদের মাথার ওপর এসে গেছে। কেউ যদি সামান্য নীচের দিকে তাকায় তাহলে আমাদের দেখে ফেলবে এবং আমরা ধরা পড়ে যাব। মহানবী (সা.) তখন বলেন, لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا অর্থাৎ দুঃখ কোরো না, নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন। এ শব্দগুলোর প্রতি গভীরভাবে লক্ষ করুন। মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর সিদ্দীককে নিজের সঙ্গে যুক্ত করে বলেছেন– إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا– নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন। এখানে مَعَنَا শব্দে তারা উভয়ে অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ তোমার এবং আমার সাথে রয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা এক পাল্লায় মহানবী (সা.)-কে এবং অপর পাল্লায় হযরত আবু বকর সিদ্দীককে রাখেন। সে সময় তাঁরা দুইজনই পরীক্ষার মধ্যে ছিলেন। কারণ এটিই

ছিল সেই স্থান, যেখান থেকে হয় ইসলামের ভিত্তি আরও সুদৃঢ় হবার ছিল নতুবা ইসলামের সমাপ্তি ঘটার ছিল। শত্রুরা গুহার মুখে উপস্থিত ছিল এবং নানা ধরনের মতামত ব্যক্ত হচ্ছিল। কেউ বলছিল, এ গুহায় খুঁজে দেখো, কেননা পায়ের চিহ্ন এ পর্যন্ত এসেই শেষ হয়েছে। আবার তাদের কেউ কেউ বলছিল, এখানে মানুষের যাতায়াত কীভাবে সম্ভব? গুহার মুখে তো মাকড়সা জাল বুনে রেখেছে এবং কবুতর ডিম পেড়ে রেখেছে। তাদের এসব কথার আওয়াজ গুহার ভেতর পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছিল এবং মহানবী (সা.) অত্যন্ত স্পষ্টভাবে সেসব কথা শুনছিলেন। শত্রুরা মহানবী (সা.)-কে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে এসে পড়ে এবং তারা উন্মাদের মতো ছুটে আসে। কিন্তু তাঁর (সা.) পরম সাহসিকতার দিকটি খেয়াল করুন! শত্রুরা তাঁর মাথার ওপর ঠায় দাঁড়িয়ে, অথচ তিনি তাঁর নিষ্ঠাবান সাথি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে বলছেন, لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا এ শব্দগুলো অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে, মহানবী (সা.) তাঁর মুখে শব্দগুলো উচ্চারণ করেছিলেন। কারণ এটি শ্রুত শব্দের মুখাপেক্ষী; কেবল ইশারা-ইঙ্গিত যথেষ্ট ছিল না। বাইরে শত্রুরা পরামর্শ করছে আর গুহার ভেতরে মনিব ও সেবকও আলোচনায় ব্যস্ত রয়েছেন। তাঁরা এ বিষয়ে কোনো তোয়াক্কা করেন নি যে, শত্রুরা শব্দ শুনে ফেলতে পারে। এটি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তাঁর (সা.) পরিপূর্ণ ঈমান ও তত্ত্বজ্ঞানের একটি প্রমাণ। আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতির প্রতি তাঁর (সা.) পূর্ণ আস্থা ছিল।

হিজরতের এই সফরে আরও অনেক ঘটনা ঘটেছে যেগুলোর মাধ্যমে তাঁর (সা.) খোদানির্ভরতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ইনশাআল্লাহ্, সেগুলো আগামীতে বর্ণনা করা হবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)